গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৮ - ২৪ মার্চ ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পর্ষদে ৭০৪ কোটি, সিইএসসি-তে ৬৫.৪৮ কোটি টাকা মাশুলবৃদ্ধির পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে

২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান

বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে এই জনস্বার্থবিরোধী মাশুল বৃদ্ধিকে প্রতিরোধের চেষ্টাও চলেছে। এস ইউ সি আই এবং অ্যাবেকার আন্দোলনের ফলে বেশ কিছু দাবিও আদায় হয়েছে। যেমন বর্তমান বছরে গৃহস্থদের ৩০০ ইউনিট, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ১৫০ ইউনিট, ক্ষুদ্রশিল্পে ৫০০ ইউনিট পর্যন্ত সরকারি ডিউটিতে ছাড় আদায় করা হয়েছে। তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি প্রয়োগ করে সকলের জন্য সমান করে দেওয়া বিদ্যুতের দাম প্রতিহত করা হয়েছে; প্রতি মাসে ইউনিট প্রতি ৬০ পয়সা হারে ফুয়েল সারচার্জ আদায় করা বন্ধ হয়েছে; লোডভিত্তিক সিকিউরিটির পরিবর্তে ৩ মাসের বিলই সিকিউরিটি হিসাবে স্থির হয়েছে এবং সিকিউরিটির উপর গ্রাহক ৬ শতাংশ সুদ পাবেন; ফিক্সড চার্জ (হর্সপাওয়ার প্রতি) ১০ টাকা আদায় বন্ধ হয়েছে; কৃষিতে ৩ মাসের অগ্রিম বিলের পরিবর্তে মাসিক বিলের ব্যবস্থা হয়েছে; মিটারের জন্য অগ্রিম টাকা নেওয়া বন্ধ হয়েছে; বিনা খরচে গ্রাহকদের মিটার পাল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে; লোডভিত্তিক অ্যাভারেজ বিল করা বন্ধ হয়েছে এবং ১২ মাসের বিলের গড় করে অ্যাভারেজ বিল চালু হয়েছে।

এর ফলে সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রাহকদের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়েছে। কিন্তু গ্রাহকেরা এই সুফলকে উপলব্ধি করার আগেই পুনরায় মাশুলবৃদ্ধি করে দেওয়া হচ্ছে। যেমন লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও সিইএসসি মাশুল বৃদ্ধি চেয়েছে ৬৫ কোটি টাকা আর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রকৃতপক্ষে ৭০৪ কোটি টাকা। কমিশন এই আবেদন মঞ্জুর করলে আগামী এপ্রিল মাস থেকে এর প্রায় সবটাই সাধারণ গ্রাহকদের উপর চেপে যাবে। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্রে যখন কৃষিতে বিনা পয়সায় এবং অন্যান্য রাজ্যে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে — তখন পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে বিদ্যুতের দাম সব থেকে বেশি থাকা সত্ত্বেও স্যালো টিউবওয়েলের (এসটিডব্লু) ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ২৬৮৬ টাকা এবং অন্যান্য জেলায় ৩৩১০ টাকা এবং সাবমারসিবল পাম্পের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ২৮৭০ টাকা এবং অন্যান্য জেলায় ৪১৩৮ টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এমনিতেই কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যা আগামী দিনে আরো ব্যাপক আকার নিতে বাধ্য। বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে ডাকাতি, তোলাবাজি, রাহাজানি ইত্যাদি।

এই সবই ঘটে চলেছে পূর্বতন বিজেপি সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু হওয়ার ফলে। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে বিদ্যুৎশিল্পে যে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃত্তি পরীক্ষার নামে সরকারের নয়া প্রতারণা

এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ১২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"রাজ্য সরকার প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে বিরাট ক্ষতি করেছে। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে আমাদের দল এবং বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রয়াত ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সহ বহু শিক্ষাবিদ ও ব্যাপক জনগণ দীর্ঘদিন আন্দোলন করা সত্ত্বেও সরকার কর্ণপাত করেনি।

"এই অবস্থায় আমাদের দলের উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছর বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এতে এ পর্যন্ত ২০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। এই অভিনব আন্দোলন ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। রাজ্য সরকার ও সি পি এম নেতৃত্ব এই বৃত্তি পরীক্ষাকে বানচাল করার জন্য বারবার স্কুলগুলিকে নির্দেশ ও হুমকি দিয়েছে যাতে তারা এই পরীক্ষায় সহযোগিতা না করে। বহু স্থানে সেন্টার করতে দেয়নি, এবং হামলা করে সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে ; নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিপুল সক্রিয় সহযোগিতায় উত্তরোত্তর পরীক্ষার্থী ও সেন্টার বাড়ছে। এবং সি পি এম-এর কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক অংশ এতে অংশ নিচ্ছেন। ফলে বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ করার সকল অপকৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর রাজ্য সরকার আর একটি ষড়যন্ত্র করছে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে এমন একটি পরীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যাতে নম্বর দেওয়া, পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি দেওয়া থাকবে না। এটা প্রতারণামূলক স্কিম ছাড়া আর কিছু নয়।

"আমরা দাবি করছি, রাজ্য সরকারকে পাশ-ফেল প্রথা সহ বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হবে।"

রাশিয়ায় বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ বাড়ছে

রাশিয়ার মানুষ আবার আন্দোলনে নামছেন। কেবল পেনশনভোগী সোভিয়েট আমলের পুরনো মানুষেরাই নয়, নবীন প্রজন্মের ছাত্র-যুবকরা সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামছে। কেবল একটি শহরে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, ইউক্রেন, জর্জিয়ায় আগেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল; এখন, গত জানুয়ারি মাস জুড়ে রাজধানী মস্কোর বুকে পথ অবরোধ, প্রশাসনিক ভবন অবরোধ, ধর্না ক্রমাগত বাড়তে থাকায় রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে। আরও আশঙ্কা এজন্য যে, সোভিয়েট শাসনে জনজীবনের অগ্রগতি, স্বাচ্ছন্দ্য, মর্যাদা, লেনিন ও স্ট্যালিনের যোগ্য নেতৃত্ব, চরিত্রের মহত্ব, সেযুগে বিশ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের উচ্চস্থান — ঘুরে ফিরেই এসব কথা এসে পড়ছে।

রাশিয়ার ছাত্রদের বিক্ষোভ

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ছিল ; শিক্ষা, চাকরি, এবং অবসরজীবনে সবদিক থেকে স্বনির্ভরতা নিশ্চিত ছিল। পেনশনভোগী এবং সেনা ও পুলিশ কর্মচারীরা বিনামূল্যে পরিবহণ, ওষুধ, স্বল্পমূল্যে টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস প্রভৃতি পেতেন। পুঁজিবাদ ফিরে আসার পর, বারবারই এগুলি প্রত্যাহারের কথা উঠেছে কিন্তু তা কার্যকর করার সাহস সরকার পায়নি।

কেন সরকার এগুলি প্রত্যাহার করেনি তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেছেন — "১৯১১ সালে প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর, যখন শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত অধঃপতিত হতে শুরু করে তখন হৃতসর্বস্ব জনগণের জন্য সরকারি 'দাক্ষিণ্য' হিসাবে, সোভিয়েট আমলে পাওয়া সামাজিক সুরক্ষার বেশিরভাগই যে রেখে দেওয়া হয়, সেটা বঞ্চিত জনগণের জীবনের যন্ত্রণা লাঘব করার উদ্দেশ্যে নয়। এর লক্ষ্য ছিল জনগণের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালা ....।"

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইসব প্রাপ্য সুযোগসুবিধা দেওয়ার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। প্রতিবিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়াব্যবস্থা যে তা দিতে পারে না, তার উল্লেখ করে নীনা আন্দ্রিয়েভা বলেছেন — "একটা দেউলিয়া রাষ্ট্র তার বাজেটের শূন্য ভাঁড়ার থেকে দীর্ঘদিন এজন্য টাকা দিতে পারে না।" তিনি আরও বলেছেন — "পেনশনসম্বল যে জনগণ অর্ধভুক্ত অবস্থায় কোনমতে প্রাণধারণ করছিলেন, পুতিন সরকার এক কলমের খোঁচায় তাঁদের পুরোপুরি নিঃস্বে পরিণত করায়, জমে ওঠা পুঞ্জীভূত ক্ষোভই রাজপথে নামতে বাধ্য করেছে।"

এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে প্রাপ্য সুবিধা প্রত্যাহার করে, তার বদলে কিছু টাকা ধরিয়ে দেওয়ার সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মস্কো, লেনিনগ্রাদ সহ প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পেনসনভোগীদের প্রাপ্য অত্যাবশ্যক সুবিধা বজায় রাখার দাবির প্রতি ছাত্র,

সাতের পাতায় দেখুন

স্ট্যালিনের মতো নেতা চাইছেন রাশিয়ার মানুষ

মস্কো, ৫ মার্চ, মধ্যবয়সীদের যতই বিরূপ ধারণা থাক না কেন, রাশিয়ার যুবসমাজ যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখছে স্ট্যালিনকে। সম্প্রতি রাশিয়ায় একটি জনমত সমীক্ষা রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫০ শতাংশ রুশ বিশ্বাস করেন যে, স্ট্যালিন দেশের স্বার্থে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে ৩৭ শতাংশ রুশ এখনও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছেন। জার্মানির সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, রাশিয়ার ৪০টি প্রদেশ জুড়ে এই সমীক্ষা চালায় একটি বেসরকারি সংস্থা। তরুণ প্রজন্মের মতে, দেশের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং অপরাধ দমনে স্ট্যালিনের মতো কোনও নেতাকেই প্রয়োজন রাশিয়ার। আর এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অনেকেই মনে করেন, দেশে কমিউনিস্ট জমানা ফিরে আসা উচিত।

— পি টি আই, (আনন্দবাজার, ৬-৩-০৫)

বীরভূম

নলহাটি পুরসভায় সুইপারদের বিক্ষোভ

পুর এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে যারা নিয়োজিত সেই সুইপারদের সমস্যা নিয়ে পুরকর্তৃপক্ষগুলি কার্যত উদাসীন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের বাজারে মাত্র ১৫০০ টাকা মাসিক বেতনে যারা কাজ করে তাদের পক্ষে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সুইপারদের সমস্যা নিয়ে বীরভূম জেলার নলহাটি পুরসভায় আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনের ধারায় ২০০৪ সালের ১৮ জুলাই পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটি সুইপার্স ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১১ জন সুইপারকে স্থায়ী করার কথা। কিন্তু ৮ মাস পেরিয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষ চুক্তি কার্যকর করেনি।

ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আবারও আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়। গত ৪ মার্চ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চার দফা দাবিতে চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। দাবি ছিল, (১) অবিলম্বে ১১ জন সুইপারকে চুক্তিমত স্থায়ী করা, (২) বেতন বৃদ্ধি, (৩) রাস্তা সারাইয়ের কাজে মহিলা সুইপার নিয়োগ, (৪) সমস্ত ওয়ার্ডগুলি থেকে রোটেশানে লোক নিয়োগ করা।

এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম। চেয়ারম্যান দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বীরভূম

শ্রমিকদের রেল অবরোধ, দাবি আদায়

২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রেলওয়ে 'রাউন্ড দি ক্লক লোডিং সিস্টেম' চালু করার ফলে রাজগাঁও স্টোন কোম্পানিতে ওয়াগন লোডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানার ৫০০০ শ্রমিকের কর্মহীন হয়ে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। রেলওয়ে বোর্ডের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত বাতিল ও কারখানার শ্রমিকদের অন্যান্য দাবিতে ১ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কারখানার একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত রাজগাঁও স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২০০০-এর বেশি শ্রমিক রাজগ্রাম স্টেশনে রেল অবরোধ করে। অবরোধ ৩ ঘণ্টা চলার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন নেতৃত্বের সাথে কথা বলে এবং দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তা মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইউ টি ইউ সি-এল এসের বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজগাঁও স্টোন কোং লেবার ইউনিয়নের সহসম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, উপযুক্ত পরিকাঠামো, বিশেষত রাতে লোডিং সাইডে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, লোডিং প্ল্যাটফর্ম, শ্রমিকদের রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত শ্রমিকদের পক্ষে রাউন্ড দি ক্লক লোডিং সিস্টেম মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত আন্দোলনের চাপে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঐ সিস্টেম স্থগিত করে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এস ইউ সি আই দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক ও রাজগাঁও স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জিয়াদ বক্সী, এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই আন্দোলনের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

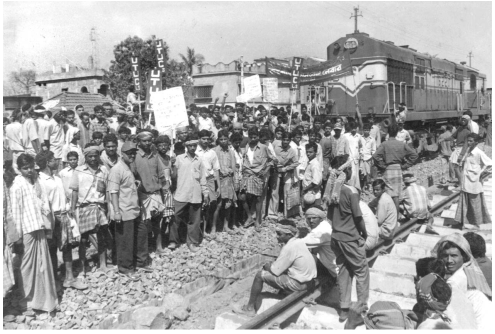

মুর্শিদাবাদ

সুচিকিৎসা ও হাসপাতাল চত্বরে সমাজবিরোধী উপদ্রব বন্ধের দাবি

হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ, সুচিকিৎসা, প্যাথলজি বিভাগ চালু ও হাসপাতাল চত্বরে সমাজবিরোধী দুষ্টচক্রের উপদ্রব বন্ধের দাবিতে গোধনপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রানীনগর শাখা। ২ মার্চ শতাধিক স্থানীয় মানুষ এই ডেপুটেশনে যোগ দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আলি আকবর এই হাসপাতালের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, একটি দুষ্টচক্র এই হাসপাতালে কোনও সুচিকিৎসককে টিকতে দেয় না। বর্তমানে ডাঃ বিভাস চন্দ্র বৈরাগীকেও ওই দুষ্টচক্র তাড়াতে চায়, যদিও এলাকার মানুষ মনে করেন ওই চিকিৎসক দরিদ্র মানুষের চিকিৎসায় যথেষ্ট মনোযোগী এবং আন্তরিক। এক শ্রেণীর ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতালকর্মীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাঁরা দুঃস্থ রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এস্রাফিল হোসেন সরকারি স্বাস্থ্যনীতির সমালোচনা করেন। ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন বি এম ও এইচ ডাঃ সুব্রত মণ্ডলের কাছে দাবিপত্র জমা দেন। ডাঃ মণ্ডল দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেন। এদিনই নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবের শতাধিক সদস্য ওই হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায়। ক্লাবের সদস্যদের অভিযোগ, ডাঃ বৈরাগীর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাকে সুচিকিৎসা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, তাঁরা এটা বরদাস্ত করবেন না। তাঁদের অভিযোগের আঙুল ডাঃ সুব্রত মণ্ডলের দিকেই।

শিলাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আন্দোলনে দাবিপূরণ

দক্ষিণ দিনাজপুর

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও তপন ব্লকের তিনটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র শিলাঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাড়ি-ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, বহু মানুষ দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হয়। পরদিন সকালে দেখা যায়, বেশিরভাগ মাটির ঘরের চাল নেই, কৃষ্ণনগরে প্রতিবন্ধীদের স্কুলঘরটি ভেঙে ইঁটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। এইরকম বিপর্যয় সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন ত্রাণ, কোন সাহায্যের ব্যবস্থা হয়নি। সরকার এবং শাসক দলগুলোর উদাসীনতা ও অবহেলা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ঘটনার পরেই এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদকের নেতৃত্বে কর্মীরা দুর্গত মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে যান। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর মেরামতের জন্য অনুদান, নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এই কর্মসূচি দুর্গত মানুষদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য শত শত মানুষ এগিয়ে আসেন এবং সরকার, প্রশাসন ও শাসক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১ মার্চ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ মিছিল সহকারে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেন। 'জলঘর-ভাটপাড়া-মালঞ্চা গণকমিটি'র নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ ডেপুটেশন ও মিছিলে এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মীরা অংশ নেন।

জেলাশাসক উপস্থিত থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং কয়েক কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে ও বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে — এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই কৃষিদপ্তরকে দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফসলের ক্ষতির হিসাব নেবার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রশাসনকে দিয়ে বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতিরও হিসাব নেবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের আমন চাষের জন্য বীজ ও সার সরবরাহ করা হবে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামতের জন্য অনুদান দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে স্পেশাল জি আর দেওয়ার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন। আন্দোলনের এই জয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যাপক ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠেছে, তেমনই পার্টি ও আন্দোলনের প্রতি আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

বীরভূম

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রামপুরহাট ২নং ব্লকের বেশ কিছু গ্রামে কয়েকশ' বাড়ি এবং বিস্তীর্ণ এলাকার জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আকস্মিক এই ঝড়ে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। জনসাধারণের চাপে বিডিও এবং পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সরকারি সাহায্য না পাওয়ায় সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ৮ মার্চ ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি অঞ্চলের ঐ সমস্ত গ্রামের দুই শতাধিক মানুষ বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে তিনি আগাম সংবাদ না দিয়ে আসায় প্রথমে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন, পরে বিক্ষোভকারীদের চাপে পড়ে দাবিপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং তখনই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টদের অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কমরেডস্ সুবর্ণ মাল, লক্ষ্মীনারায়ণ মাল, অমল মণ্ডল ও সাইদুল ইসলাম।

জলপাইগুড়ি

যুবস্বেচ্ছাসেবক শিবির

গত ৫-৬ মার্চ এ আই ডি ওয়াই ও'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে যুবস্বেচ্ছাসেবক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই-এর জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান যুবজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে স্বেচ্ছাসেবকদের কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ শিবিরে উপস্থিত এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট নেতা কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী, এ আই ডি ওয়াই ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জীবন সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। শিবিরে ব্যায়াম ও ড্রিল শেখান কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী। স্বেচ্ছাসেবকরা নানাধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘটে। স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, একাগ্রতা ও দায়িত্ববোধ এলাকার জনগণের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

কলকাতা

উর্দু-মাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন

গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কলকাতার ১৫টি উর্দু-মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্র প্রদান, (২) উর্দুতে ভূগোল ও বিজ্ঞানের বই উপযুক্ত মান বজায় রেখে প্রকাশ এবং (৩) কলেজগুলিতে উর্দু-বিভাগ খোলার দাবি জানানো হয়। সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এই মিছিলের আয়োজন করেছিল। কমিটির সহ সভানেত্রী ইসমত আরা খাতুন এবং সম্পাদক ইমতিয়াজ আলম উর্দু-মাধ্যম ছাত্রদের সমস্যার প্রতি সরকারের উদাসীনতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই দাবিগুলি পূরণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন।

বাবরি মসজিদ ভাঙার দায় স্বীকারে বাধ্য হলেন বাজপেয়ী

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন সম্প্রতি একটি মালয়ালম ম্যাগাজিন 'মানব সংস্কৃতি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গুজরাট দাঙ্গা দমনে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। গুজরাটে যখন আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল প্রভৃতি বিজেপি'র শাখা সংগঠনগুলি সংখ্যালঘু মুসলমানদের হত্যা করছিল, মহিলাদের গণধর্ষণ, বাড়িঘর-দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক লুঠতরাজ চালিয়েছিল, সেই সময় দাঙ্গা থামাতে বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। রাষ্ট্রপতি নারায়ণন আরও বলেছেন, সেনাবাহিনীকে দাঙ্গায় জড়িতদের গুলি করার ক্ষমতা দেওয়া হলে এই দাঙ্গা এড়ানো যেত (বর্তমান, ৩-৩-০৫)। রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্ন উঠবেই, তা হল — দাঙ্গাবাজদের দমনে গুলি চালানো হল না কেন? কেন বাজপেয়ীজি দাঙ্গা থামাতে সেনাবাহিনীকে সক্রিয় করলেন না? সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে নারায়ণন দাঙ্গা দমনের নির্দেশ দিলেও এন ডি এ সরকার বা গুজরাটের বিজেপি সরকার সেনাবাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি কেন? রাষ্ট্রপতি নারায়ণন নিজ নির্দেশ লঙ্ঘিত হতে দেখেও কেন প্রতিবাদ করেননি সে প্রশ্নও সঙ্গত। কেন্দ্রে ও গুজরাট রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের এই ভূমিকা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি বাজপেয়ীজি উদার চরিত্রের মানুষ? বিজেপি'র ভেতরকার কট্টরপন্থীদের সঙ্গে বাজপেয়ীজির একটা পার্থক্য দেখাতে প্রায়ই যে তাঁকে 'নরমপন্থী' বা 'বিবেচক' মানুষ হিসাবে দেখানো হয়, তা কি আদৌ সত্য?

বাজপেয়ীজির গায়ে উদারতার যে আলখাল্লা ছিল, সেটাকে আবারও খুলে দিয়েছে 'আউটলুক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ। বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য বাজপেয়ীজি যে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন, সিডি-তে রেকর্ড করা সেই বক্তব্য ফাঁস করে দিয়েছে এই পত্রিকাটি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়। তার আগের দিন, ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, করসেবকদের সামনে বাজপেয়ীজি বলেছিলেন, 'জমিনকো সমতল করনা হোগা' — অর্থাৎ 'জমি সমতল করে দিতে হবে।' একথার দ্বারা মসজিদ ভাঙতেই তিনি উস্কানি দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, 'ম্যায় নেহি জানতা কাল ঔর ক্যায়া হোগা' — অর্থাৎ পরদিন আরও কী কী ঘটবে, তা তিনি বলতে পারছেন না (সংবাদ প্রতিদিন ঃ ১৮-০২-০৫)। পরের দিন যে গুরুতর এবং অকল্পনীয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে, বাজপেয়ীজির কথায় তারই ইঙ্গিত ছিল না কি? পরদিনই দেখা যায়, করসেবকরা পূর্ব পরিকল্পনা মতই তেমন ঘটনাই ঘটিয়েছে। পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে বাবরি মসজিদ অতি দ্রুত ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এই ধ্বংসের উস্কানিদাতা হিসাবে বাজপেয়ীজির ভূমিকা কি তাঁর উগ্র হিন্দুত্ববাদী চরিত্রকেই প্রকট করে দেখাচ্ছে না? ফলে আদবানীজিই শুধু নন, বাজপেয়ীজিও উগ্র হিন্দুত্ববাদেরই ধারকবাহক — একথা বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় কি?

সকলেই জানেন, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন জনসংঘ নাম পরিবর্তন করে (হিন্দুত্ববাদ পরিত্যাগ না করে) বিজেপি হয়েছিল। এহেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটে তৃণমূল কংগ্রেস সহ আরও কিছু শরিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। বিজেপি'র সঙ্গে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা দুটি যুক্তি দেখিয়েছিল। প্রথমত তারা বলেছিল, এন ডি এ'র কর্মসূচিতে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাগুলি নেই।

দ্বিতীয়ত বলেছিল, এন ডি এ'র নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত বাজপেয়ীজি কট্টর হিন্দুত্ববাদী নন এবং তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উদার চরিত্রের মানুষ। তাদের এই যুক্তি যে নিছকই অজুহাত, আজ তা নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত হলেও বিজেপি'র চরিত্র যে সাম্প্রদায়িক, সেদিন তা তাঁরা জানতেন না এমন নয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা জাগিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতেই যে বিজেপি সংসদে আসন সংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ২ থেকে বাড়িয়ে ৮৬ করেছে এটা শরিকদলগুলির অজানা ছিলনা। তাছাড়া বাজপেয়ীজি নিজেকে বরাবরই আর এস এস-এর সদস্য এবং 'স্বয়ংসেবক' বলতে গৌরববোধও করেন। তাহলে এহেন বাজপেয়ীজিকে সংবাদপত্রের একাংশ এবং এন ডি এ'র শরিকদলগুলি উদারপন্থী হিসাবে তুলে ধরেছে কেন? এবং বিজেপিও বাজপেয়ীজির মুখে উদারপন্থার মুখোশ পরিয়েছে কেন? বাজপেয়ীজিকে উদারপন্থী মুখোশ পরতে হয়েছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদকে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য, নাহলে শরিকদলগুলির পক্ষে সরাসরি বিজেপি জোটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। শরিকদলগুলিও সরকারি ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার উদগ্র লোভে জেনেশুনেই বাজপেয়ীজির উদারতার একটা মিথ্যা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে বিজেপিকে সাহায্য করেছে এবং সাম্প্রদায়িক বিজেপি জোটকে সমর্থনের ঢাল হিসাবে তা ব্যবহার করেছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট ক্ষমতায় আসার পর বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই বিজেপি সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে বারবার মুসলিম ও খ্রিস্টান বিদ্বেষ উস্কে দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে গুজরাটের ডাংস জেলায় ধর্মান্তরকরণকে অজুহাত করে খ্রিস্টানদের উপর যখন বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল, সেই সময়ও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তার কোন নিন্দা তো করেনইনি, বরং 'ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে জাতীয় বিতর্ক দরকার' এই কথা বলে তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী আক্রমণকারীদেরই উৎসাহিত করেছিলেন। ফল যা হবার তাই হয়েছিল। বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সশস্ত্র তাণ্ডবে বাইবেল পোড়ানো, খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের ধর্ষণ করা এবং গীর্জায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই সময় গুজরাট পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সি পি সিং আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতির জন্য বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মীদের দায়ী করে বলেন, 'গুজরাটে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর বিপদ তৈরি হয়েছে।' তথাপি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তাণ্ডব থামানোর কোন উদ্যোগই নেননি। সবকিছু দেখেও তিনি না দেখার ভান করে থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেস সহ বাজপেয়ী সরকারের শরিকদলগুলিও মুখে কুলুপ আঁটে।

২০০২ সালে গুজরাটের ভয়ঙ্কর দাঙ্গার মোকাবিলায় বাজপেয়ীজি কী ভূমিকা নিয়েছিলেন? নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে প্রায় দু'মাস ধরে, ভোটার লিস্ট ধরে ধরে সংখ্যালঘু মুসলিম নিধন যজ্ঞ চলে। দেশের সাংস্কৃতিক গৌরবের চরম অপমান করে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ভারতগৌরব ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ মাটিতে মিশিয়ে প্রশাসনের সহায়তায় সেখানে রাতারাতি পিচের রাস্তা বানিয়ে দেয়। সেই সময় অটলবিহারী বাজপেয়ী দূরদর্শনে বলেছিলেন, 'গুজরাটের ঘটনা জাতির ললাটে কলঙ্ক চিহ্ন' এবং এটা 'বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের সম্মান নিচে নামিয়ে দিয়েছে।' বাজপেয়ীজির এই অনুতাপ আন্তরিক ছিল না, তাই দাঙ্গা কবলিত গুজরাটে তিনি ছুটে যাননি, দাঙ্গা থামাবার চেষ্টাও করেননি। গুজরাটে বাজপেয়ীজি এলেন দাঙ্গা শুরুর এক মাসেরও বেশি সময় পরে। বাজপেয়ীজি যদি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সক্রিয় হতেন, তাহলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটত না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বাজপেয়ীজি জেনে-শুনে নিষ্ক্রিয় থেকে দাঙ্গাবাজদেরই তাণ্ডব চালাতে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, গুজরাট দাঙ্গাকে বাজপেয়ী-আদবানী সহ বিজেপি'র প্রত্যেক শীর্ষ নেতাই গোধরা ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্ত করে দাঙ্গা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে যুক্তির ভিত্তি দিতে চেষ্টা করেছেন এবং দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। এঁদের ভাবখানা এমন ছিল, যেন গুজরাটে যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে।

গোধরার ঘটনার প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের না করে, এই ঘটনাকে সামনে রেখে 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে' — এই বলে বিজেপি গুজরাট দাঙ্গাকে জাস্টিফাই (যুক্তিগ্রাহ্য) করতে গিয়ে যে সত্যকে জেনেবুঝে লুকিয়ে ছিল তাহল, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দুই'ই তাঁদের পক্ষ থেকেই পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। নানা তদন্তে বারবারই প্রমাণিত হয়েছে যে, গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন ভিতর থেকেই লাগানো হয়েছিল, বাইরে থেকে নয়। আর, যেহেতু ভিতরে প্রায় সকলেই ছিল বিজেপির রামসেবক, তাই তদন্তে এটাই দাঁড়াচ্ছিল যে, অগ্নিকাণ্ডের জন্য রামসেবকরাই দায়ী। অথচ দেখা গেল, তদন্তের রিপোর্টগুলি চেপে দিয়ে সরকারি ক্ষমতা ও গলার জোরে বিজেপি গোধরা কাণ্ডের দায় মুসলিমদের উপর চাপিয়েছে। হিটলারী কায়দায় এই ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্র যে বিজেপি'র পূর্বপরিকল্পিত ছিল তা বিজেপি'র নেতাদের নানান বক্তব্য এবং আচরণ থেকেও সহজেই ধরা পড়ে।

ন্যূনতম বিবেকবোধ থাকলে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গোধরার মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ও মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গুজরাট দাঙ্গাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে ঘোষণা করে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে যখন গুজরাটের মুসলিম সমাজ জ্বলছে তখন বাজপেয়ীজি কী করছিলেন? তিনি কি মোদি সরকারকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন? রাষ্ট্রপতি নারায়ণনের কথাতেই পরিষ্কার, বাজপেয়ীজি কোন নির্দেশ দেননি। তিনি ৩৫ দিন পর গুজরাটে গেলেন এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাস্তুহারা, স্বজনহারা মুসলমান জনগণকে প্রতারিত করতে নারোদাপাটিয়া আশ্রয়শিবিরে দাঁড়িয়ে কপট অশ্রু বিসর্জন করে বলেন, এ দাঙ্গা 'হৃদয় বিদারক'। তিনি মোদি সরকারকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করলেন না, বরং মোদিকে সস্নেহে 'রাজধর্ম পালন করতে' উপদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, গোয়াতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তিনি মোদির 'ভাল কাজের' প্রশংসা করেন। আর, এই কাজে মোদি সরকারের দুই মন্ত্রী পুলিশের কন্ট্রোলরুমে ঘাঁটি গেড়ে বসে সমস্ত ছকটাই পরিচালনা করছিল। একদা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ড্যিয়া পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে দাঙ্গাকারীদের প্রতি পুলিশ কড়া না হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের একতরফা আক্রমণ চলতে দিয়েছে। পুলিশের মধ্যে যাদের ন্যূনতম বিবেক মনুষ্যত্ববোধ ছিল তারা এই মর্মান্তিক ঘটনায় কিছু করতে না পেরে ছটফট করেছে। আই এ এস অফিসার হর্ষ মান্দার বিবেক যন্ত্রণায় চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে কলম ধরেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিজেপিকে এভাবে দাঙ্গার পথে যেতে হল কেন? সকলেই জানেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ক্ষমতাসীন হয়ে বিশ্বায়নের কর্মসূচি দ্রুতগতিতে কার্যকরী করতে থাকে। তারই ফলে লকআউট, ছাঁটাই, বেকারত্ব তীব্রভাবে বাড়ছিল। মূল্যবৃদ্ধি, ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনায় বিজেপি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মোহ কাটছিল। তারই ফলে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি'র ভরাডুবি হয়। হিন্দুত্বের পরীক্ষাগার বলে কথিত বিজেপি'র শক্তঘাঁটি গুজরাটেও বিভিন্ন পৌর ও লোকাল বডির নির্বাচনে বিজেপি'র পরাজয় হয়। তাতে বিজেপি নেতাদের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। ফলে ক্ষমতা যেনতেন প্রকারেণ চাই — এই উদগ্র লালসা থেকে বিজেপি তাদের তুরুপের তাস উগ্র হিন্দুত্বের পথ গ্রহণ করে — যে পথে তারা একদিন ক্ষমতায় এসেছিল। ফলে

চারের পাতায় দেখুন

বাবরি ভাঙার ছক ১০ মাস আগেই

বাবরি ভাঙার ১০ মাস আগেই বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আর এস এস নেতারা তার ছক কষেছিলেন। গোপন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, উমা ভারতী। টিভি'র চিত্রে বাবরি ধ্বংসের পর আদবানিকে জড়িয়ে ধরে উমা ভারতীর সেই উল্লাস নিশ্চিতভাবেই ছিল সাফল্যের উচ্ছ্বাস। রজ্জুভাইয়া তখন আর এস এস প্রধান। কে এস সুদর্শন, ও এইচ এস শেষাদ্রি, সংঘ পরিবারের সব মাথাই এসেছিলেন '৯২-এর ফেব্রুয়ারির সেই বৈঠকে। চূড়ান্ত হয়েছিল বাবরি ভাঙার পরিকল্পনা। — লিখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক গোয়েন্দা দপ্তর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা আই বি'র প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা মলয়কৃষ্ণ ধর। তাঁর লেখা 'ওপেন সিক্রেটস — ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স আনভেইল্‌ড' বইতে এই প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তা সবই নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। সংঘ পরিবারের ঐ গোপন বৈঠকের ওপর আই-বি'র নজরদারির কারিগরি ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল তাঁরই হাতে। বইতে তিনি জানিয়েছেন, গোটা বৈঠকের অডিও রেকর্ডিং করেছিল আই বি, যা দেখে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে, বাবরি ধ্বংসের ১০ মাস আগে ঐ বৈঠকে সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়েছিল। সুতরাং অভিযুক্ত আর এস এস নেতারা আদালতে আগাগোড়া যে বলে আসছেন বাবরি ধ্বংস হয়েছে কিছু উত্তেজিত করসেবকের মুহূর্তের উন্মাদনায়, তা আদৌ ঠিক নয়।

বৈঠকের অডিও-ভিডিও টেপগুলি ধরবাবুর হেফাজতেই ছিল। ফলে প্রমাণ দিতে আদালতে তিনি পিছপা হবেন না। আই বি'তে তাঁর ওপরওয়ালারা যে ঐ টেপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চবনকেও দেখিয়েছিলেন, সে ব্যাপারেও তিনি নিশ্চিত। রাও সরকারের নিরুদ্বেগ ভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মলয়বাবু। ছদ্মবেশে বাবরি ধ্বংসের দিন অযোধ্যাতেই ছিলেন তিনি। শিবসৈনিকদের নিখুঁতভাবে মসজিদ ভাঙার কাজ এবং সংঘ নেতাদের উৎসাহদানের কাজের ভিডিও ছবি এবং ৭০টির মতো ছবি রয়েছে আই-বি'র মহাফেজখানায়। খোদ আদবানি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আগুন ঝরা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার থেকে যে দাবানল ছড়িয়েছিল সেটা আর আদবানির আয়ত্তে ছিল না — মন্তব্য করেছেন ধর।

এই বইতে রয়েছে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলার মতো তথ্যও। বলা হয়েছে ভি পি সিংয়ের আমলে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে উন্মাদনার পেছনে ছিল কংগ্রেসের হাত, কংগ্রেসের অর্থ।

(আজকাল ৩১-১-০৫)

বিনা আত্মত্যাগে কোনও মহৎ কাজ, মহৎ সৃষ্টি হয় না

তমলুকের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে লাগাতার গণআন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনের কর্মসূচি সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পানচাষী, ফুলচাষীদের সমস্যা, জলসেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, রেললাইন নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের দাবিতে জোরালো আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ১০ মার্চ দলের মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে ২২ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন। এই দিন বিকাল ৪টায় তমলুক রাজ ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। কমরেড সৌমেন বসুও বক্তব্য রাখেন।

তমলুক হাসপাতাল মোড় থেকে পাঁচ সহস্রাধিক মানুষের এক সুশৃঙ্খল, ব্যানার-ফেস্টুনে সুসজ্জিত মিছিল তমলুক শহর পরিক্রমা করে রাজ ময়দানের সমাবেশে পৌঁছায়। তমলুক শহরে এস ইউ সি আই দলের এত বড় জনসভা, এতবড় মিছিল তমলুকের মানুষ আগে কোনদিন দেখেনি। সুশৃঙ্খল মিছিল ও জনসভা শহরের মানুষের অজস্র প্রশংসা ও অভিনন্দন পেয়েছে।

কমরেড মানব বেরার সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা কী ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় দেশের মানুষ তা বুঝছেন। কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি সরকার, বর্তমানের কংগ্রেস সরকার বা এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার প্রচার করছে, তাদের সুযোগ্য শাসনে দেশ নাকি এগিয়ে চলেছে। দেশের যদি এত উন্নতি হচ্ছে, তাহলে বেকার সংখ্যা বাড়ছে কেন, মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে কেন, প্রতিদিন কেন গ্রাম ছেড়ে মানুষ ছুটছে শহরে কাজের খোঁজে ? একটা দেশে উন্নয়ন হচ্ছে মানে নতুন নতুন কলকারখানা হচ্ছে, বেকারত্ব কমছে, দেশের গরিব মেহনতি মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সুযোগ পাচ্ছে। বাস্তবে আমাদের দেশে ঘটছে উল্টোটা। দেশে এখন ৩৫ কোটির বেশি বেকার, ৩৬ কোটি মানুষ নিরক্ষর, ৬০ শতাংশ মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, লক আউট বেড়ে চলেছে, জোর করে অবসর করানো হচ্ছে। এটা কি অগ্রগতি ? সারা ভারতে গত ৪ বছরে পৌনে ৪ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে।

তমলুকের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

এ রাজ্যে কৃষকের অবস্থা কী ? ১৯৮৭-৮৮ সালে এরাজ্যে মোট কৃষক পরিবারের মধ্যে ভূমিহীন পরিবার ছিল ৩৯.৬ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে হয় ৪৯.৮ শতাংশ। এখন এ সংখ্যা ৫৫ শতাংশ প্রায়। এই তো দেশের অগ্রগতির চেহারা !

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বড় বড় রাস্তা হচ্ছে, শহরে ফ্লাইওভার হচ্ছে, শপিং মল, বিজনেস কমপ্লেক্স হচ্ছে, শহর তৈরি হচ্ছে, সেখানে সরকার টাকা ঢালছে, সরকারি বড় বড় বাড়ি হচ্ছে, কন্ট্রাক্টর পোষা হচ্ছে, নেতা-মন্ত্রীরা কাটমানি খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা লুঠ হচ্ছে। পাশাপাশি দেখুন গ্রামগুলোর কী দুরবস্থা, সাধারণ মানুষের কী অবস্থা ! এটাই কি উন্নয়ন ?

কিছু রাস্তা, ব্রিজ, রেললাইন করাই যদি উন্নয়ন হয়, তবে তো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের অনেক উন্নয়ন করেছে বলতে হয় !

মুষ্টিমেয় ধনী ও পুঁজিপতিদের উন্নয়নের জয়গান করছে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সি পি এম। এদের ঝাণ্ডার রঙ আলাদা, কিন্তু কার্যকলাপ এক — পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা। মালিকশ্রেণীর কে কত ভাল সেবা করতে পারে এনিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। পুঁজিপতিশ্রেণীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে ভোটে জেতা যাবে, সরকারি ক্ষমতা ভোগ করা যাবে। পুঁজিপতিশ্রেণী যাদের ভোটে জেতাতে চায়, ভোটের আগে সংবাদমাধ্যমে প্রচার দিয়ে সেই দলের পক্ষে জনমত তৈরি করে দেয়। পুঁজিপতিদের টাকায়, ক্রিমিন্যালদের শক্তি তথা পেশি শক্তির জোরে এই দলগুলি ভোটে জিতে সরকারে বা বিরোধী পক্ষে বসে এবং উভয়পক্ষই পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করে।

কেন্দ্রের ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র আমাদের দলই সাধ্যমত আন্দোলন করছে। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা লাগাতার আন্দোলন করছি। কিছু দাবি আদায়ও করেছি। প্রতিবাদ না করলে অন্যায় অবিচারের শক্তি বেড়ে যায়। লড়াই মনুষ্যত্ব দেয়, চরিত্র দেয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান আদর্শ নিয়ে আমরা লড়ছি। আজ যখন সমস্ত রাজনৈতিক দল, নেতা-মন্ত্রীরা সুবিধাবাদ ও দুর্নীতির স্রোতে ভাসছে, একমাত্র আমাদের দল উন্নত নীতি, আদর্শ ও চরিত্রের ভিত্তিতে চলছে, গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে আমাদের দলের সংগঠন বিস্তার লাভ করছে। জনগণ গভীর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে আমাদের সমর্থন করছে। এম এল এ, এম পি বা সরকারি ক্ষমতার জোরে কোন দেশে বিপ্লব হয়নি। একমাত্র সঠিক বিপ্লবী দল, সঠিক বিপ্লবী লাইনের ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করে লাগাতার গণআন্দোলনের পথে বিপ্লবী শক্তির জন্ম হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে। আমরা সেই গণআন্দোলনের রাস্তায় চলছি। আমাদের কর্মীরা রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, জনগণের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা, সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করছে। বিনা আত্মত্যাগে কোনও মহৎ কাজ, মহৎ সৃষ্টি হয় না। ভারতবর্ষে একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই। এই দলকে শক্তিশালী করুন, গণআন্দোলনকে তীব্রতর করুন। শাসক শ্রেণী, পুঁজিপতিশ্রেণী এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতিকে ভয় পায়, পুঁজিপতি শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম এই দলের প্রচার দিতে চায় না। তবু আমাদের দল দ্রুত বাড়ছে। এই মেদিনীপুরে ৩৫ বছর আগে আমি মাত্র ৪ জনকে নিয়ে মিটিং করেছিলাম। আজকের এই বিশাল সমাবেশ প্রমাণ করছে সংগঠন কত বড় হয়েছে। লড়াই ও আন্দোলনের পথ ধরে এই দলটি বাড়ছে। এই দলের শক্তিবৃদ্ধির ওপরই আন্দোলনের জয় নির্ভর করছে।

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আমাদের দল লাগাতার আন্দোলন করে চলেছে — ১৭ নভেম্বর বাংলা বন্ধ হয়েছে, ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় লক্ষাধিক মানুষের মহামিছিল হয়েছে। এই আন্দোলনকে আরও জোরালো করতেই আমাদের এই সমাবেশ।

সভাপতি কমরেড মানব বেরা বলেন, ঐতিহ্যসম্পন্ন মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করার সময় উন্নয়নের যে রঙিন স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তিন বছর পরেও তা নিছক স্বপ্নই রয়ে গেছে। তমলুক শহরকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশহর ঘোষণার আগে এ শহরের যে দৈন্যদশা ছিল, আজও তাই রয়েছে। এখন এই শহরকে গুরুত্বহীন করার জন্য শহরের মধ্যে অবস্থিত জেলা প্রশাসনিক অফিসগুলি ও আদালতকে ৬ কিমি দূরে পঞ্চায়েত এলাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন শাসকদল তথা তমলুকের এম পি লক্ষ্মণ শেঠ। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি, আন্দোলন সংগঠিত করছি। এখন আবার হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে তমলুক শহর সহ কয়েকটি ব্লককে যুক্ত করতে চাইছে। আমরা এর বিরুদ্ধে। কারণ, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে হলদিয়াকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে বেশি টাকা খরচ করা হবে, বাকি ছিটেফোঁটা খরচ হবে তমলুক এলাকায়। তাই আমাদের দাবি, তমলুক উন্নয়ন পর্ষদ আলাদা করে গড়তে হবে।

সভাপতির ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

স্বীকারে বাধ্য হলেন বাজপেয়ী

তিনের পাতার পর

গুজরাট দাঙ্গা ছিল বিজেপি'র সুচিন্তিত প্রোগ্রাম। দাঙ্গার মধ্য দিয়ে মুসলিমদের সন্ত্রস্ত করে, উগ্র হিন্দুয়ানার জাগরণ ঘটিয়ে তড়িঘড়ি বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করা হয় এবং ছকমতই বিজেপি ব্যাপক গরিষ্ঠতা পায়। এই জয়ে উল্লসিত হয়ে বাজপেয়ী ও আদবানী দু'জনেই নরেন্দ্র মোদির পিঠ-চাপড়িয়ে বলেছিলেন, 'সাবাস মোদি! আগামী দিনে বিজেপি এই পথেই চলবে।'

নির্বাচনে জেতার জন্য যে গুজরাট লাইন অর্থাৎ উগ্র সাম্প্রদায়িক লাইন বিজেপি গ্রহণ করল তা গুজরাটের নির্বাচনে ভাল ফল দিলেও, হিমাচল প্রদেশে তা ব্যর্থ হল। সেখানে প্রবল ধাক্কা খেয়ে বিজেপি ভোল বদলে সড়ক, বিজলি, পানি প্রভৃতি জনজীবনের সমস্যার কথা বলতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুত্বের স্লোগানই হোক, আর অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াই হোক, সবই বিজেপি তুলছে নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। ফলে কখনও হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরে উগ্ররূপ ধারণ আবার কখনও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তোলা — দু'টোই বিজেপি'র নির্বাচনী কৌশল, যখন যেটি প্রয়োজন তখন সেটিই সে ব্যবহার করছে এবং আগামীদিনেও করে যাবে, যদি না এই দুষ্ট রাজনীতির মূলোৎপাটন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি আমরা জনগণকে ভাবতে বলব, সেটা হচ্ছে, এইসব দুষ্ট শক্তিগুলো জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে কেন? একথা সকলেরই জানা যে, বুর্জোয়া শাসকরা জনগণের ঐক্য ভাঙতে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতকে নানা সময়ে খুঁচিয়ে তোলে। আবার একথাও সত্য যে, সমাজজীবনে ধর্মবর্ণের বিভেদ, বিদ্বেষ সূক্ষ্মভাবে না থাকলে কায়েমী স্বার্থবাজরা তাকে ব্যবহার করতে পারতো না। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বিশ্বপুঁজিবাদ যখন একদিকে তীব্র বাজার সঙ্কটে জর্জরিত, অন্যদিকে শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে আশঙ্কিত, সেই সময় ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। ফলে পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে শিল্পবিকাশের প্রয়োজনে বুর্জোয়ারা যুক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত প্রভৃতি নানা সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে নতুন চেতনায় জনগণকে উজ্জীবিত করেছে। কিন্তু যুক্তিবাদের চর্চা পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের স্তরে শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, পুঁজিবাদের পক্ষে তা বিপজ্জনকও। পুঁজিবাদের এই ঐতিহাসিক দুর্বলতার জন্য ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ধর্মীয় চেতনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, জনগণকে উর্ধ্বে তোলা তো দূরের কথা। এর ফলে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত বিভেদগুলো দেশের জনগণের মধ্যে রয়েই গেল। এ কি বুর্জোয়াদের দ্বারা আজ দূরীভূত হওয়া সম্ভব? স্বাধীন ভারতে বুর্জোয়ারাই নানা সময়ে সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে এবং গণআন্দোলন ধ্বংস করতে এই বিভেদগুলি জিইয়ে রাখছে শুধু নয়, খুঁচিয়ে তুলছে। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতপাত প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক উপাদানগুলি নির্মূল করা বুর্জোয়া দলগুলির পক্ষে ঐতিহাসিকভাবেই আজ আর সম্ভব নয়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস দেখায় যে, কংগ্রেসও বারেবারে নির্বাচনী স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছে। সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহারে বিজেপি কংগ্রেসের থেকে বহুদূরে এগিয়ে গেছে। এই দুই দলের পরিচালিত জোট আজ পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় আসছে। কিন্তু দুটি জোটই যেহেতু বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার জোট, তাই এদের কোনটিরই দ্বারা জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বরং এই দুটি জোটই ক্ষমতাসীন হয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে কাজ করছে বলে মূল্যবৃদ্ধি বেকারি ছাঁটাই প্রভৃতি সমস্যাগুলি বেড়ে চলেছে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষের জীবনধর্ম। জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বুর্জোয়াদের সেবাদাস দল ও জোটগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করাই আজকের দিনে প্রগতির চিন্তার পরিচয়। একমাত্র এই পথেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করা সম্ভব।

আবারও গ্রেনেড! আবারও রক্তস্রোত! কোথায় চলেছে বাংলাদেশ?

(বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্র ভ্যানগার্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত)

২৮ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা। শাহবাগের সংবাদপত্র স্টলে পত্রিকা দেখছিলেন এক ভদ্রলোক। একটি দৈনিক হাতে নিয়েই তিনি অস্ফুটে বলে ওঠেন, 'দেশটা ক্রমশ শকুনের ভাগাড় হয়ে যাচ্ছে!'

পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন আরেক ভদ্রলোক। মন্তব্যটা তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। তিনিও চোখ রাখেন পত্রিকার পাতায়। দেখেন, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ব্যানার শিরোনাম — 'গ্রেনেড হামলায় সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া নিহত।' খুব স্বাভাবিকভাবেই আঁতকে ওঠেন তিনি; প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'এ হত্যাযজ্ঞের শেষ কোথায়?'

তাঁর এ চিৎকার আরও কিছু মানুষকে টেনে আনে। শেষে স্টলটিকে ঘিরে একটা জটলা সৃষ্টি হয়ে যায়।

হবিগঞ্জের বৈদ্যেরবাজারে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা হয়েছে ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যা সোয়া ৭টায়। খবরটা রাতে ঢাকায় খুব বেশি প্রচারিত হয়নি। তাছাড়া রাত ১১টা পর্যন্ত খবর ছিল, ওই হামলায় তিনজন নিহত এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া আহত হয়েছেন। তাঁকে ঢাকায় আনা হয় রাত সাড়ে ১১টায়। তখন ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর কথা মানুষ জেনেছে পরের দিনের পত্রিকা মারফত। এবং তাদের কাছে তা ছিল আকস্মিক ও খুবই হৃদয়বিদারক। তাই এ চিত্র ওইদিন শুধু শাহবাগ নয়, রাজধানীর অনেক স্থানেই দেখা গেছে। সর্বত্র মানুষের মাঝে ছিল আতঙ্ক আর বিক্ষোভ। কেউ কেউ এমনও প্রশ্ন তুলেছেন, দেশটা কি পাকাপাকিভাবে দুর্বৃত্তদের দখলে চলে গেল?

আসলে, ১৯৯৯ সাল থেকে দেশে যেভাবে প্রতিকারহীনভাবে একটার পর একটা বোমা ও গ্রেনেড হামলা ঘটে চলেছে, সেই সাথে ঘটনাসমূহের লক্ষ্য এবং তীব্রতা ক্রমান্বয়ে যে রূপ ধারণ করছে, তা দেখে ওই প্রশ্ন তোলাটা অসঙ্গত কিছু নয়। প্রথম দিকে শুধু বোমার ব্যবহার দেখা গেলেও, গত কিছুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির গ্রেনেড। এসব বোমা হামলায় একসময়ে শুধু সাধারণ মানুষ নিহত হলেও এখন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারাও খুন হচ্ছেন। সবার জানা আছে, গত ২০০৪ সালে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ঘটনাক্রমে বেঁচে গেলেও ওই হামলায় নিহত হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতা-কর্মী। সর্বশেষ ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জের গ্রেনেড হামলায় নিহত হলেন শাহ এএমএস কিবরিয়া। তাছাড়া গত ২১ জুন ২০০৪ সিলেটে গ্রেনেড হামলার শিকার হয়েছিলেন বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। খুলনায় বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন সাংবাদিক মানিক সাহা, হুমায়ুন কবীর বালু এবং বেলালউদ্দিন। এসবের ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যায়, পরবর্তী বোমা ও গ্রেনেড হামলার লক্ষ্য কে?

কিবরিয়া হত্যার দায়িত্ব সরকার কিছুতেই এড়াতে পারে না

দেশের প্রতিটি নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। সংবিধানেও এ কথাটা স্পষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু কিবরিয়া সাহেবের বেলায় বিএনপি-জামাত জোট সরকার কি সে দায়িত্ব পালন করেছে? সব পত্রিকার খবর হল, ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জের ওই জনসভায় কোন পুলিশী নিরাপত্তা ছিল না। অথচ জনসভার আয়োজকদের তরফ থেকে এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় জানানো হয়েছিল। অবশ্য পুলিশ বলেছে, তাদেরকে তা জানানো হয়নি। তবে দু'দিন ধরে জনসভার মাইকিং হয়েছিল, যার ফলে কিবরিয়া সাহেবের ভাষণ শুনতে জনসভা স্থলে শত শত মানুষ এসেছিল, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না। পুলিশ কি তবে কানে তুলো দিয়ে তাদের কাজকর্ম করে? তাছাড়া, কিবরিয়া সাহেব সাবেক অর্থমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, উপরন্তু বর্তমান সংসদেরও একজন সদস্য। অন্যদিকে গত দু'বছরে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকটি জনসভায় বোমা ও গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছে। তার ফলে প্রথম সারির নেতাসহ দলটির বহু নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। তাদের নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপিকে তো প্রকাশ্য জনসভায় গুলি করে খুন করা হয়েছে। এতকিছু জেনেও পুলিশ কিবরিয়া সাহেবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিল না কেন? দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকরা বলেছেন, কিবরিয়া সাহেবের মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে। তার মানে হবিগঞ্জ হাসপাতালে তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধে উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। সরকার চাইলে তাঁকে দ্রুত ঢাকায় এনে যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারত। এজন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে, কোন বিচারেই, কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু সরকার বিন্দুমাত্রও নড়াচড়া করেনি! তাই হলফ করেই বলা যায় যে, কিবরিয়া হত্যার দায়িত্ব বিএনপি-জামাত জোট সরকার কিছুতেই এড়াতে পারে না।

এখন প্রয়োজন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের খুঁজে বের করা, কিন্তু তা হবে কি?

২৭ জানুয়ারি গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটার পরপরই সব মহল থেকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের খুঁজে বের করার দাবি উঠেছে। সরকারের তরফ থেকেও এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, প্রতিবার যেমন করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুয়ারি সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজে বের করতে চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। এর আগে ২৯ জানুয়ারি দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "হামলাকারীদের খুঁজে বের করে আইনানুগ কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করাই এ মুহূর্তের কর্তব্য।"

পাঠকদের হয়তো স্মরণে আছে, এই একই কথা ঠিক একই ভাষায় তিনি ২১ আগস্টের পর দেওয়া বিবৃতিতেও বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। বরং জনগণের বিক্ষোভ একটু থিতিয়ে আসার পর, আমাদের শাসকদের আচরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঘটনার দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগের ওপর চাপানো হয়েছিল। সেই সাথে তদন্তের নামে যাও একটু নড়াচড়া হচ্ছিল তা-ও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবারও কি তা-ই হবে? লক্ষণ সেরকমই দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি দল এবং তার মিত্ররা একযোগে বলে চলেছে যে, আওয়ামী লীগ দিনক্ষণ (৩০ এপ্রিল?) ঘোষণা করে সরকারের পতন ঘটাতে না পেরে সরকারের পদত্যাগের পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অর্থাৎ তারা কিবরিয়া হত্যার দায় সরাসরি আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। সরকারের মন্ত্রীরা এমন কথা বলার পর তদন্ত সুষ্ঠু হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে কি?

আমরা জানি, এ সংশয় প্রকাশের বিপরীতে বলা হবে, আওয়ামী লীগও তো কিবরিয়া হত্যার দায়ে সরাসরি বিএনপিকে অভিযুক্ত করেছে। আমাদের কথা হল, ঘটনার যারা শিকার তারা অনেক অভিযোগই তুলতে পারেন। সেগুলো কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের। তার জন্য সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজন। তা না করেই মন্ত্রীরা কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন কীভাবে? সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, তারা যেকোন মূল্যে গ্রেনেড হামলার হোতাদের খুঁজে বের করবে। তদন্ত না করেই কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার পর তাদের ওই বক্তব্য কি নিছক কথার কথায় পরিণত হয় না?

যা হোক, আমরা দেখেছি সরকার এ গ্রেনেড হামলা তদন্তের জন্য একটা কমিটি করেছে। তার প্রধান করা হয়েছে পুলিশের সিলেট জোনের ডিআইজিকে। তিনি তদন্তের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও এখনও কোন কুলকিনারা করতে পারেননি। পুলিশ এবং র‍্যাব ইতোমধ্যে কয়েকজনকে সন্দেহবশত গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশ বিএনপি ও ছাত্র দলের সাথে যুক্ত, একজন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। ইসলামি ছাত্র শিবিরের সাবেক এক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জামাতের চাপে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এখনও আটক আছে তাদেরকে বহুদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলাফল কিছুই জানা যায়নি। অনেকে বলাবলি করছেন, এসব গ্রেফতার আসলে আইওয়াশ মাত্র। পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে আওয়ামী লীগ নেতা বাদে বাকিদেরকে শিবির-নেতার মত ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন আটক রাখা হচ্ছে জনগণকে প্রবোধ দিতে যে, সরকার দোষীদের ধরতে খুবই আন্তরিক!

আবার আন্তর্জাতিক তদন্ত! আবারও এফবিআই!

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যে তদন্ত কমিটি এখন কাজ করছে তাদের ওপর সরকারের নিজেরও আস্থা নেই। যদি তা না হয়, তাহলে এ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার পরপরই সরকার কথিত আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে এফবিআই বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে এদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন? লক্ষণীয় ব্যাপার হল, অন্য অনেক বিষয়ে পরস্পর প্রায় খুনোখুনির ভাব দেখালেও এফবিআই আসার প্রশ্নে সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে দারুণ মিল দেখা যাচ্ছে। উভয়ের মাঝে এ নিয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতাও আছে। যেমন ২১ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ শুরু থেকে বার বার আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছিল। এর অংশ হিসেবে তারা এফবিআই'র কথাও বলেছিল। সরকার এ দাবির প্রতি প্রথম দিকে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। এক পর্যায়ে এফবিআই এলেও সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল, সরকারের আনুষ্ঠানিক কোন অনুমতি বা আমন্ত্রণ এ ব্যাপারে ছিল না। এমনকী নীতি নির্ধারক মন্ত্রীদের অন্যতম আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নাকি এফবিআই-এর আগমনের খবর জানতেন না। অথচ এবার আওয়ামী লীগ দাবি জানানোর আগেই সরকার ফলাও করে প্রচার করেছে যে, তারা এফবিআই ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ২১ আগস্ট হবিগঞ্জ গ্রেনেড হামলার তদন্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর মানেটা কী? এটা কি হোয়াইট হাউস বা ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটকে তোষণের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে টেক্কা দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টা? এফবিআই হল মার্কিনী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ব্রিটিশ, এটা সবার জানা। গোয়েন্দা কাজে বা অপরাধী খুঁজে বের করার কাজে এদের দক্ষতা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় বেশি, এ নিয়েও কোন সংশয় নেই। কিন্তু দু'টো প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণরূপে স্ব-স্ব সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ নিজ নিজ সরকারের স্বার্থের বাইরে এরা এক পা-ও এগোয় না। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে সংঘটিত বহু ঘটনা আছে রাজনৈতিকভাবে যার তাৎপর্য বিরাট, সেগুলোর কোন সুরাহা আজও ওই প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারেনি। যেমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যা এবং ব্রিটিশ রাজকুমারী ডায়ানার মৃত্যু ঘটনার সম্পর্কে ওদের জনমনে অনেক প্রশ্ন থাকলেও তা নিরসন করা হয়নি। তাছাড়া এফবিআই-এর প্রধান দায়িত্ব হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান করা, যেকোন সন্ত্রাসী হামলা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। কিন্তু ৯/১১ ঘটনা ঠেকাতে তারা ব্যর্থ হল কেন?

যাক্ এ নিয়ে এ পরিসরে লম্বা আলোচনার সুযোগ নেই। আমাদের বক্তব্য হল, বর্তমানে যেসব দেশকে জড়িয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে, বাংলাদেশ তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের তেল-গ্যাস-বন্দর সহ জাতীয় সম্পদ এবং বিশেষত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ওদের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব কী, সচেতন দেশপ্রেমিক কোন মহলেরই তা অজানা নয়। এ কারণে ওদের দিক থেকে আমাদের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের উত্তরোত্তর প্রচেষ্টাও এখন কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় এফবিআই বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এদেশে এসে তথাকথিত, নিরপেক্ষ তদন্ত চালাবে, একথা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন কেউই বিশ্বাস করতে পারেন না।

হবিগঞ্জ গ্রেনেড হামলার তদন্ত নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে গত কয়েকদিনে যেসব কথা চালাচালি হল সেগুলো খেয়াল করুন, তাহলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। সরকার এফবিআই-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ২৮ বা ২৯ জানুয়ারি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত মার্কিন বক্তব্য হল, সরকারের দেওয়া প্রস্তাব তাদের বিবেচনাধীন আছে। (স্মরণ করুন, ২১ আগস্টের পর সরকারি আমন্ত্রণ ছাড়াই এফ বি আই চলে এসেছিল)। তারা শর্ত দিয়েছিল, এফ বি আই-কে সকল আলামত, সাক্ষ্য ও তথ্য জানার অবাধ অধিকার দিতে হবে। সরকার বলছে তথাস্তু। কিন্তু এরপরও মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস একের পর এক মন্ত্রীর সাথে দেখা করে একই কথা আউড়ে যাচ্ছেন। শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সাথেও দেখা করে তিনি একই শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসলে কি শর্ত শুধু ওটুকুই? না, আরো আছে? খবরে প্রকাশ, মার্কিন সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা নাকি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সাথে টেলিফোনে ওইসব শর্ত নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু মোর্শেদ খান বলেছেন, তার সাথে কোন শর্তের ব্যাপারে আলোচনা হয়নি। কী এমন শর্ত যে, মোর্শেদ খান তার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু কিন্তু আছে, যা মানতে সরকার বিব্রত বোধ করছে। নইলে অন্তত ২১ আগস্টের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এফবিআই এদেশে আসতে এত সময় নেওয়ার কথা নয়।

এ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য হল, এফবিআই-এর একজন প্রতিনিধি গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি এখানে এসে ঘুরে গেছে। তার সাথে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে। তারা আবারও তাকে এই তথাকথিত শর্ত মানার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও, তদন্তের জন্য এফবিআই এদেশে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুশ প্রশাসন নাকি ইতস্তত করছে।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হানা (হিউম্যানেটারিয়ান এসিস্টেন্স নিডস্ এসেসমেন্ট), এমওআই (মেমোরেন্ডাম অব ইন্টেন্ট), বিজ্ঞান ও

সাতের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় সর্বাত্মক সফল ছাত্র ধর্মঘট

ত্রিপুরায় সিপিএম সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠছে। আন্দোলনও নানা সময়ে ফেটে পড়ছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও সারা ত্রিপুরা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সর্বনাশা নোডাল ব্যবস্থা বাতিল, ফি-বৃদ্ধি প্রত্যাহার, পাঠ্যবই সরবরাহ, স্থায়ী শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়োগ, অনলাইন লটারির জুয়া বন্ধ প্রভৃতি পাঁচ দফা দাবিতে ছিল এই ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের বিরাট সমর্থন লক্ষ্য করে সরকারের ধামাধরা ছাত্রসংগঠন এস এফ আই ও পুলিশ পিকেটিংরত ছাত্রছাত্রীদের টানা-হ্যাঁচড়া করে সরিয়ে দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার কাজে নামে। এই আক্রমণ সত্ত্বেও ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। পুলিশ আন্দোলনকারীদের থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করে। পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে ন্যায়সঙ্গত ছাত্র আন্দোলনে হামলার তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড বাবুল বণিক। একই সঙ্গে তিনি ত্রিপুরার সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে ধর্মঘট সফল করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারীরা আন্দোলনে

কে আই টি, এইচ আই টি, কে এম ডব্লু অ্যাণ্ড এস এ, কে এম ডি এ প্রভৃতি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের কয়েক হাজার কর্মচারী আজ উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। তাঁদের চাকরি ও জীবনজীবিকা আজ চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বৃহত্তর কলকাতা সহ পুরসভার সাধারণ মানুষ যেটুকু পরিষেবা পাচ্ছিলেন তাও আজ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস রাজেন্দ্রকুমার সম্প্রতি 'কে এম ডি এ পুনর্গঠন' শীর্ষক এক রিপোর্টে সুপারিশ করেছেন, উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক লক্ষ্যে চালাতে হবে এবং তার জন্য বিভিন্ন অফিস তুলে দিতে বা বন্ধ করতে হবে, কর্মী সংকোচন করতে হবে, বিভিন্ন অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বেসরকারি হাতে দিতে হবে, পরিকাঠামো ও মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রি করে উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে একত্রীকরণ করতে হবে, স্বেচ্ছাবসর চালু করতে হবে, বিভিন্ন কাজ বাইরে থেকে করাতে হবে, কেএমডিএ-র স্যানিটেশন ও জলসরবরাহ দপ্তরকে কেএমডব্লু অ্যান্ড এসএ-র হাতে তুলে দিয়ে তাকে বেসরকারি মালিকানায় দেওয়ার জন্য কোম্পানিকরণ করতে হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেএমডব্লু অ্যান্ড এসএ-কে টাটার সংস্থা জুসকো (JUSCO)-র হাতে তুলে দেওয়ার কথা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। জুসকো এই ব্যাপারে ইটালির সহযোগিতা নিচ্ছে। অথচ এই সমস্ত উন্নয়ন সংস্থা গড়ে উঠেছিল ব্যবসা করে লাভের জন্য নয়, জনকল্যাণের প্রয়োজনে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া ও দুই ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকায় উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনই বাণিজ্যিক লক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। এজন্যই বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে এইসব সংস্থায় যোগ দেওয়া সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও তা মেনে নিয়েছেন। তাই একটা সময় এই সংস্থাগুলি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল। এই রিপোর্টে তার স্বীকৃতিও মেলে।

কে এম ডব্লু অ্যান্ড এস এ মূলত মাটির উপরের জল শোধন করে সরবরাহ করে। এই সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য মূল্যবান পরিকাঠামো তার আছে। এদিকে মাটির নিচে জলস্তর নেমে যাওয়া এবং আর্সেনিক দূষণের কারণে জল উত্তোলনে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে। এরকম অবস্থায় মাটির ওপরের জলের ওপর সাধারণ নাগরিকরা বেশি নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং তা সরবরাহ করার পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এই সংস্থাকে লাভজনক করার অজুহাতে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। অথচ কলকাতা করপোরেশন ও অন্যান্য পুরসভাগুলিতে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা জলের বকেয়া দাম বাবদ এই সংস্থার প্রাপ্য প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। যা করতে হলে রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে এই সংস্থা অত্যন্ত সচ্ছলতার সাথে পরিচালনা করে বহু টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। এইসব দিকগুলি বিবেচনা না করে রাজেন্দ্রকুমার বেসরকারীকরণ ও কর্মচারী ছাঁটাইয়ের সর্বনাশা সুপারিশ করেছেন।

এর প্রতিবাদে গত ৪ ফেব্রুয়ারি যৌথ সংগ্রাম মঞ্চের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (JPA) অনুমোদিত সিএমডিএ কর্মচারী ইউনিয়ন সহ সাতটি কর্মচারী সংগঠন। তারা সকলেই দাবি জানিয়েছে — উন্নয়ন সংস্থাগুলির হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন বিভাগের অধীনে এনে উন্নয়ন সংস্থাগুলির সমস্ত কর্মচারীকে সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে; সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে হবে; মৃত কর্মচারীর পোষ্যদের নিঃশর্তে চাকরি দিতে হবে। বলা বাহুল্য, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এই আন্দোলন উন্নয়ন সংস্থার সর্বস্তরের কর্মচারীদের আরও ব্যাপক আন্দোলনে উৎসাহিত করেছে।

ভাঙন-দুর্গতদের পাশে এস ইউ সি আই

মুর্শিদাবাদে ভাঙন-দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই। ৮ মার্চ ৫ দফা দাবিতে ডোমকল রবীন্দ্র মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। ভাঙন-দুর্গতদের প্রতিটি পরিবারে কাজ, অভুক্ত পরিবারগুলিতে খাদ্য-বস্ত্র-ওষুধ প্রদান, অনাহারে মৃতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ভাঙনে বাস্তহারাদের পুনর্বাসন এবং গঙ্গা-পদ্মা-ভৈরবের ভাঙনরোধে মাস্টার প্ল্যানের দাবি তোলা হয়। অবরোধে আটকে-পড়া শত শত মানুষও এই দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অবরোধস্থলে বক্তব্য রাখেন কমরেড দেবাশিস চক্রবর্তী। পরে ডোমকল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে দাবিগুলি কার্যকরী করার আবেদন জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড্স্ হায়দার আলি ও আশিস হালদার। এদিন রানীনগর, লালবাগ ও নবগ্রামে বিডিও অফিসে একই দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়া দাবিগুলির সমর্থনে নওদা, ভগবানগোলা ও সাগরদিঘিতে মিছিল করা হয়।

২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান

একের পাতার পর

এর মধ্য দিয়ে। এর ফলে (১) বিদ্যুৎ শিল্পকে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন এই তিনটি পৃথক শিল্পে পরিণত করা হচ্ছে — যার ফলে গড় মাশুল বেড়ে চলেছে হু হু করে, (২) প্রতিটি শিল্পে লগ্নীকারীদের ১৬ শতাংশ থেকে ৩১ শতাংশ নীট লাভ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, (৩) তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বন্ধ করে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইনটির ফলে শুধু মাশুলই বাড়ছে না, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২১ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, সেখানে এই বিদ্যুৎনীতির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন বন্ধ হতে চলেছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আসল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে বিদ্যুৎ শিল্পে লগ্নীকারীদের স্বার্থরক্ষা করা এবং গ্রাহকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ্য শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রাহকদের কোর্টে যাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এই জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ করতেই হবে। আন্দোলনের চাপে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ নতুন করে পর্যালোচনার কথা ঘোষণা করেছে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, এসব হচ্ছে এনডিএ সরকারের সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করার ফল। তখন এইসব দল ঐ আইন বাতিল করার দাবি তুলেছিল। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত বামপন্থীরা ঐ আইন বাতিল চাইছে না। তারা চাইছে, নিছক পর্যালোচনা। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী পি এম সঈদ বলেছেন, যেসব বিষয় নিয়ে বামপন্থীদের সাথে বিরোধ ছিল, তা মিটে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য বলেই মনে হয় — কারণ ইতিমধ্যেই বাধাহীনভাবে জাতীয় বিদ্যুৎনীতি ঘোষণা করা হয়েছে এবং মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় বিদ্যুৎ মাশুল নীতি ঘোষণা করা হবে। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রকে দিয়ে দু'একটা ছোট-খাটো পরিবর্তন করিয়ে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে এই জনস্বার্থবিরোধী আইনটিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

এমতাবস্থায় একদিকে সিপিএম ফ্রন্টের এই দ্বিচারিতার মুখোস খুলে দেওয়া, অপরদিকে জনস্বার্থবিরোধী সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ সম্পূর্ণ বাতিলের দাবি অবিলম্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের কাছে তুলে ধরা খুবই জরুরি। সাথে সাথে প্রয়োজন এপ্রিল মাসে প্রস্তাবিত মাশুলবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি গড়ে তোলা। এই দ্বিমুখী প্রয়োজনকে অনুভব করেই আগামী ২২ মার্চ দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য অ্যাবেকার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গড়ে তুলুন, আন্দোলনের কর্মী হিসাবে নাম লেখান, দিল্লি অভিযানে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিন।

অনাহারে মৃত্যু নিয়ে বুদ্ধবাবুর নিষ্ঠুর পরিহাস

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে অনাহারে ৬ ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে, এ রাজ্যে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু মৃতদের পরিবারের লোকেরা জানেন, এই মিথ্যাচারের দ্বারা রাজ্য সরকার আসলে তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে। আমলাশোলের দরিদ্রতর মানুষ, জলঙ্গির ভাঙনদুর্গত সবহারা মানুষ জানেন অনাহারে মৃত্যু কী বীভৎস! তিলে তিলে মৃত্যু! সে মৃত্যু আসে অপুষ্টি ও নানা রোগের ছদ্মবেশ ধারণ করে। তাই বুদ্ধদেববাবুদের বলতে বিবেকে আটকায় না যে এ মৃত্যু অনাহারে নয়, অপুষ্টিতে। এর দ্বারা আইনি ফাঁকফোকরে দায় এড়ানো যেতে পারে, গরিব ও গরিবতর মানুষদের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু বামপন্থা ছেড়ে কথা বলবে কেন? গরিব মানুষদের চোখের জল ও দুঃসহ যন্ত্রণা মোছানোর যে অঙ্গীকার নিয়ে একদিন বামপন্থা মাথা তুলেছিল, সেই বামপন্থা বারবার তাড়া করবে বুদ্ধদেববাবুদের।

অনাহারে মৃত্যুর কথা স্বীকার করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন আসে। উন্নয়নের নামে যে মিথ্যার বেলুনে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছেন, তা ফুটো হয়ে যায়, তাই বুদ্ধদেববাবুরা গরিবদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে নারাজ। কিন্তু শিল্পপতিদের জন্য তাঁদের দরজা খোলা। বিনে পয়সায় জমি, নামমাত্র মূল্যে বিদ্যুৎ, ট্যাক্স মকুব — কত সুবিধাই তাঁরা দিচ্ছেন পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার জন্য। বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে গরিবরা সমাজে অবাঞ্ছিত। বুদ্ধদেববাবুরা এখন বুর্জোয়াদের চশমাতেই দেখেন। তাই গরিবদের সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন রিপোর্ট দেন না, গরিবদের সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনে আন্দোলন করে ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনেন না। বন্ধ চা-বাগানে আকস্মিক কাজ হারিয়ে অনাহারে-অপুষ্টিতে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যুর যে রিপোর্ট অনুরাধা তলোয়ার কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে দিয়েছিল, সিপিএম সরকার তাকেও অস্বীকার করল। কেন্দ্রীয় সরকারকে ভুল এবং মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে তাদের এ আচরণ মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস নয় কি? এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হল বামপন্থা বর্জন করার পরিণামেই।

নেপালে স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে কলকাতায় জনসভা

নেপালে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে 'মূল প্রবাহ অখিল ভারত নেপালি একতা সমাজে'র কলকাতা শহর কমিটির উদ্যোগে গত ৬ মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আমন্ত্রিত বক্তা, এস ইউ সি আই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিপ্লব চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে নেপালের জনগণের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র কর্তৃক দেউবা সরকারকে বরখাস্ত করা, জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও হরণ করে জরুরি অবস্থা জারি করা, সামরিক শাসন নামিয়ে আনা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অবিলম্বে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পুলিশ ও সি পি এম-এর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জনসভা

নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর রায়দিঘি থানার ওসি'র জুলুম বন্ধ করা এবং মিথ্যা কেস প্রত্যাহার করার দাবিতে গত ৯ মার্চ রাধাকান্তপুরে এক জনসভায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল এলাকার শত শত মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরেই ঐ ওসি শাসকদল সি পি এমের স্বার্থে এস ইউ সি আই-এর কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভদ্রপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তুলসি মাঝির শালি জমির উপর দিয়ে সি পি এমের সুকেশ বৈদ্য ১৪৪ ধারা অমান্য করে জোর করে রাস্তা নির্মাণ শুরু করে। সেখানে উপস্থিত থেকে একাজে সাহায্য করে রায়দিঘি থানার ঐ ওসি এবং মন্দিরবাজারের সি আই। তুলসি মাঝির পরিবারের মহিলারা প্রতিবাদ করলে পুলিশ ও সিপিএমের লোকেরা তাঁদের প্রচণ্ড মারধোর করে এবং বাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। আহত মহিলারা দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন থাকেন। অথচ সুকেশ বৈদ্যের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১০২জন এস ইউ সি আই কর্মীর নামে মিথ্যা কেস সাজিয়ে চার্জশিট দেয়, যার মধ্যে একজন মৃত মহিলার নামও আছে।

৯ মার্চ রাধাকান্তপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড গুণসিন্ধু হালদার

এই অত্যাচার ও লুঠের ঘটনার বিষয়ে থানাতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও প্রতিকার না হওয়ায় বাধ্য হয়ে অত্যাচারিতরা ডায়মন্ডহারবার এস ডি জে এম কোর্টে মামলা করে। কেসের সমন পাওয়ার পরে রায়দিঘি থানার উক্ত ওসি রাধাকান্তপুর অঞ্চলের এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। তা অস্বীকার করায় গত ২২ জানুয়ারি কাতলাপাড়া গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী দিবাকর নস্করকে ও সি মিথ্যা ডাকাতির কেস দিয়ে কোর্টে চালান দেয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ভদ্রপাড়া গ্রামের গণেশ নস্কর, কয়ালের চকের কাশীনাথ জাতুয়া এবং দুলাল হালদারকে রাত্রে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাকাতির কেসে কোর্টে চালান দেয়। ঐ ওসি বারবার রাধাকান্তপুর অঞ্চলে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে — মামলা প্রত্যাহার না করলে এস ইউ সি আই-কে খতম করা হবে।

বামফ্রন্টের পুলিশ-প্রশাসন ও সিপিএমের এই লাগাতার এস ইউ সি আই-বিরোধী সন্ত্রাসের প্রতিবাদেই আহূত হয়েছিল ৯ মার্চের জনসভা। সেখানে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, কমরেড প্রহ্লাদ পুরকাইত প্রমুখ। প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সহদেব নস্কর।

কলকাতায়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গড়িয়াহাট মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রচারসভার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। নারীনির্যাতন, পণপ্রথা, নারীপাচার, অশ্লীল পত্র-পত্রিকায় ও বিজ্ঞাপনে নারী দেহের প্রদর্শন, ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া ও সুপ্রিমকোর্টের অগণতান্ত্রিক রায়ের প্রতিবাদে বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী বর্তমান পরিস্থিতিতে যে ব্যাপক নারী নির্যাতন ঘটে চলেছে তা তুলে ধরে বলেন, যথার্থ নারীমুক্তি আনতে হলে প্রয়োজন পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের সাথে নিজেদের যুক্ত করা।

৮ মার্চের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর, সভানেত্রী কমরেড ভারতী রায় ও সংগঠনের প্রবীণ সদস্যা বিশিষ্ট শিক্ষিকা কমরেড প্রতিভা গুপ্ত।

এই সভা থেকে ভবানীপুরের পরিচারিকা সুনীতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবস্থান বিক্ষোভ পরিচালনা করেন রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড সুমিত্রা মৈত্র।

রাশিয়ায় গণবিক্ষোভ বাড়ছে

একের পাতার পর

সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর লোকজন সংহতি জানায়। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্রদের ক্ষোভের প্রধান কারণ হল, বিনামূল্যে পরিবহনের সুযোগ বন্ধ করা এবং পুতিনের আমলে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত হরণ। ইতিমধ্যে ইউক্রেন ও জর্জিয়ায় তীব্র ছাত্র আন্দোলনের সামনে সেখানকার সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের প্রতি সৈনিকদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এখন স্পষ্ট। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে ক্রুদ্ধ পুতিন মন্ত্রীসভার সদস্য এবং আঞ্চলিক প্রশাসকদের ওপর দোষ চাপিয়ে বলেছেন তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

রুশ জনগণ ও ছাত্রযুবকদের বিক্ষোভ সেখানকার বুর্জোয়া ব্যবস্থার শিরোমণিদের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠছে। সহনশীল রুশেরা পথে নামে না, আইন মেনে চলতে ভালবাসে — এই বদ্ধমূল ধারণা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। ওয়াকিবহাল মহলেরও ধারণা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সোভিয়েট আমলের অধিকারগুলি যত কাড়া হবে বিক্ষোভ তত বাড়বে এবং রুশ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) আরও বলেছে — "সরকারের এসব পদক্ষেপ কেবল পেনশনসম্বল মানুষকেই নয়, রাশিয়ার সর্বস্তরের মানুষকে — প্রতিবিপ্লবের আঘাত যাদের সোভিয়েট আমলের অবস্থা থেকে টেনে নামিয়েছে, অধিকারহীন, প্রতিবাদের ভাষাহীন, অসহায় অবস্থায় অধঃপতিত করেছে, তাদের সকলকে গভীরভাবে ধাক্কা দিয়েছে।

"রাশিয়ার জনগণকে আজ বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং বহুজাতিকে নিয়ে গঠিত আমাদের মহান সোভিয়েট মাতৃভূমিকে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে সামিল হতে হবে।"

(সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, মার্চ ১১, রাবোচে-ক্রিস্তিয়ানস্কায়া প্রাভদা — ইউক্রেন, ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দখলের প্রতিবাদে

১৯ মার্চ

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের উদ্যোগে

কলকাতায় বিক্ষোভ

জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বেলা ১টা

বাংলাদেশে গ্রেনেড হামলা

পাঁচের পাতার পর

প্রযুক্তিসংক্রান্ত চুক্তির নামে কতগুলো চুক্তি স্বাক্ষর ও অনু-স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে মার্কিন সামরিক-বেসামরিক যেকোন কর্মকর্তা এদেশে মার্কিন স্বার্থবিরোধী যেকোন বিষয়ে তদন্ত করতে আসতে পারে। সরকার এ ব্যাপারে অনুমতি দিতে বাধ্য। পত্রপত্রিকার খবর অনুসারে, কিছুদিন আগে এদেশ থেকে নাকি কে একজন ই-মেইলে জর্জ বুশকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। এফবিআই এদেশে এসে অবাধে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে, যদিও এর ফলাফল আমাদের সরকারও জানতে পারেনি। আমরা চাই, বোমা-গ্রেনেড হামলার তদন্ত করতে যারা এফবিআইকে আনার ব্যাপারে অতি উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারা এ বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন। তাদের কাছে আমাদের বিনীত বক্তব্য, এফবিআই-এর তথাকথিত তদন্তে বিশ্বাস রাখার কোন কারণ নেই। ওরা যদি কোন ক্লু খুঁজে পায়ও যদি তা প্রকাশ করলে ওদের কোন স্বার্থ উদ্ধার হয়, তাহলেই ওরা তা প্রকাশ করবে, নইলে নয়। তখন ওরা এই ক্লুকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে আরও বড় ধরনের স্বার্থ আদায়ের প্রয়াস চালাবে — যার পরিণামে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

খেয়াল করুন, হ্যারি কে টমাস গত ৩১ জানুয়ারি আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন এফবিআই-র তদন্ত বিষয়ে তাদের সরকারের মনোভাব জানাতে। কিন্তু আলোচনা করেছেন কী বিষয়ে? আসলে আলোচনা নয়, তিনি রীতিমত জেরা করেছেন মওদুদ সাহেবকে — কেন বাংলাদেশ মার্কিন চাহিদা মত জাতিসংঘের কিছু সনদ এখনও পাশ করেনি। এ তথ্য মওদুদই জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। অবশ্য, মওদুদ বলেননি, কোন্ কোন সনদের কথা টমাস বলেছেন। ওই একই সাক্ষাৎকারে টমাস টিফা চুক্তির প্রসঙ্গও তুলেছিলেন। জানা গেছে, টিফা (ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরের জন্য ওয়াশিংটন বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ দিয়ে চলেছে। গ্রেনেড হামলার তদন্তের সাথে জাতিসংঘ সনদ পাশ বা টিফা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্পর্ক কী? বুদ্ধিমানদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এজন্যই আমরা বলেছি, এফবিআইকে আনা মানে খাল কেটে কুমির আনা।

বোমা-সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ে না কেন?

সরকার তদন্ত কাজে এফ বি আই-কে স্বাধীনতা দিতে চায়; দেশীয় সংস্থাগুলোকে দেয় না কেন? আজ পর্যন্ত দেশে যতগুলো বোমা ও গ্রেনেড হামলা হয়েছে, চট্টগ্রাম-বগুড়াসহ যতগুলো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে, তার একটারও তদন্ত কাজ এগোয়নি। সমস্যাটা কোথায়? সেটা কি প্রযুক্তিগত, না রাজনৈতিক? মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, 'প্রশাসনিক দুর্বলতা' এর নেপথ্য কারণ হতে পারে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংসদে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীও তা স্বীকার করেছেন। এফবিআই বা কথিত আন্তর্জাতিক তদন্তের অনুরাগীরা কি এদিকটা ভেবে দেখেছেন? আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা যে এর সপক্ষে অব্যাহত প্রচার চালাচ্ছেন, তারা কি বলবেন তাদের আমলে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি কেন? তখন তো তারা ভুল করেও বলেননি যে, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অথর্ব, তাই তারা তদন্তে সাফল্য পাচ্ছে না। বরং এ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উঠলেই তারা জনগণকে আশ্বাসবাণী শোনাতেন যে, তদন্ত এগিয়ে চলেছে, অচিরেই তারা অপরাধীদের ধরে ফেলবেন। আজকে ওই সমস্ত প্রবোধবাণী চরম প্রতারণা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। একই প্রতারণা বর্তমান সরকারও করেছে।

পত্র-পত্রিকার নানা প্রতিবেদন থেকে এটা আজকে খুব স্পষ্টভাবে দেখানো যাবে যে, সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর কোনটারই রহস্য সরকারের অজানা নয়। যেমন সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার পর এখানে আমাদের সরকারের কোন অনুমতি ছাড়াই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এসেছিল। তারা নাকি দীর্ঘদিন অনুসন্ধান চালিয়ে ওই ঘটনার ক্লু বের করেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি। পত্রিকার ভাষ্যমতে, তারা উগ্র মৌলবাদী শক্তিকে ওই হামলার জন্য দায়ী করেছিল। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশ সরকারের অভিন্ন অবস্থান কারও অজানা নয়। আমাদের সিআইডিও নাকি প্রায় একই ক্লু খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই সরকারি নির্দেশে ওই তদন্ত কাজ থেমে গিয়েছিল।

এরকম আরও অনেক নজির দেখানো যাবে যেগুলো সাক্ষ্য দেবে সরকার যদি আন্তরিকভাবে সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর অন্তত মাঠ পর্যায়ের সংগঠকদের বের করতে চায়, তাহলে দেশীয় সামর্থ্য দিয়ে তা করা অসম্ভব নয়। (চলবে)

(ভ্যানগার্ড, ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06
R. No 5268 / 60

ঝাড়খন্ড, গোয়া ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল চেহারা

বিধানসভা নির্বাচনের পর ঝাড়খণ্ডে সরকার গঠন নিয়ে গত কয়েকদিনে যে কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে প্রচারিত ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা ও তার কুশীলবদের ক্ষমতালিপ্সার কদর্য চেহারা আরও একবার প্রকাশ পেল, অত্যন্ত নগ্নভাবেই পেল। এভাবে রাজ্যপালের পদকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে ও বিধায়ক কেনাবেচায় মদত দিয়ে সরকার গড়া অথবা ভাঙার ব্যাপারে কংগ্রেসের হাতযশ নতুন নয়। অতীতে বহুবার বহু রাজ্যেই তারা একাজ করেছে। তবে এবারের ঘটনার একটি নতুন দিক ও নতুন তাৎপর্য আছে। এবার কংগ্রেস তার এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণে সাথী হিসাবে পাশে পেয়েছে সি পি এম-সি পি আই-কে। কংগ্রেসের সাথে এ দুটি দলের আজকের মতো প্রকাশ্যে না হলেও, গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়া বহুকাল ধরেই আছে, কিন্তু রাজ্যপালকে ব্যবহার করে গদি দখলের এমন নোংরা কার্যকলাপে নীরব থেকে সমর্থন জানানোর মতো আচরণ করতে সি পি এম- সি পি আই-কে অতীতে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। বরং 'কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস করতে হবে' বলে একদা যেসব হৈ চৈ ও লড়াইয়ের ভান সি পি এম নেতারা করেছেন, তার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। অথচ, এবার গোয়া ও ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে দুই রাজ্যপাল, যথাক্রমে এস সি জামির ও সিবতে রাজি পুরোপুরি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এজেন্টের কাজ করেছেন। গোয়ার রাজ্যপালের হঠাৎ মনে হল, পারিকারের মুখ্যমন্ত্রীত্বে চলা বি জে পি'র সরকার গরিষ্ঠতা হারিয়েছে ; অতএব বিধানসভায় গরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। এরপর সন্দেহজনক ভোটাভুটিতে পারিকার সরকারকে ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের প্রতাপ রানেকে মুখ্যমন্ত্রী করে নতুন সরকার বসানো হয়। গরিষ্ঠতার পরীক্ষায় গোলমাল বাধিয়ে রানে-সরকার কোনরকমে উতরে গেলেও, কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারে, কিছু বিধায়ক ভাঙিয়ে না আনতে পারলে সরকার রাখা যাবে না। তখনই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল। এই গোটা ঘটনায় সি পি এম নেতারা নীরব রইলেন। অথচ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সি পি এমের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল, তারা বাধা দিলে কংগ্রেসের পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল না।

ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল সিবতে রাজি নির্বাচনের পর জে এম এম-কংগ্রেস জোট গরিষ্ঠতার প্রমাণ না দিতে পারা সত্ত্বেও তার নেতা শিবু সোরেনকে সরকার গড়তে ডাকলেন, গরিষ্ঠ বিধায়কের স্বাক্ষর হাতে থাকা সত্ত্বেও বি জে পি-জে ডি (ইউ) জোটকে ডাকেননি। রাজ্যপালের এই ভূমিকার মধ্যে পক্ষপাত যখন একেবারে নগ্ন হয়ে গেল, একমাত্র তখনই সি পি এম পলিটব্যুরো বিবৃতি দিয়ে বলল, রাজ্যপাল তড়িঘড়ি করে ফেলেছেন। অর্থাৎ রাজ্যপালের ভূমিকার মধ্যে তারা চরম অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক কিছু পেলেন না, শুধু তাড়াতাড়ি করার কারণে কিছু ভুল দেখলেন মাত্র। এই আচরণের দ্বারা বামপন্থী নাম নিয়ে চলা সি পি এম নেতৃত্ব কি ভারতবর্ষের জনগণের চোখে 'বামপন্থা'র মর্যাদা বাড়ালেন ? বাস্তবে এ ঘটনা দেখিয়ে দিল, সি পি এমের সংগ্রামবিমুখ বামপন্থা আজ গদিসর্বস্ব সংসদীয় রাজনীতির পাঁকের মধ্যেই মোক্ষলাভ করেছে ; বামপন্থা ও গণতন্ত্রের নামে যেসব বড় বড় কথা এখনও তাঁরা বলেন, সেগুলি দলের সৎ কর্মীদের ভোলাবার বুলি মাত্র।

শেষপর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে সরকার গড়ার ডাক পেয়ে বি জে পি নেতারা উল্লসিত হয়ে ভান করছেন যেন গণতন্ত্রের প্রতি তাঁরা প্রবল শ্রদ্ধা নিয়ে চলেন এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এক 'মহৎ লড়াই'য়ে তাঁরা জয়ী হয়েছেন। ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়। বি জে পি'র রাজনীতির মধ্যে গণতন্ত্র ও নৈতিকতা কংগ্রেসের চেয়ে কোনভাবেই যে বেশি নেই, সেকথা বি জে পি নেতা অর্জুন মুণ্ডার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের সময়ই পরিষ্কার হয়ে গেল। শিবু সোরেনের জে এম এম-কংগ্রেস জোট যেমন গরিষ্ঠতা প্রমাণ দেওয়ার দৌড়ে জিততে নিজের জোটের কাউকে মন্ত্রী না করে, অন্য দলের বিধায়কদের মন্ত্রী করেছিল, অর্জুন মুণ্ডাও ঠিক তেমনই শপথ নিয়েই সর্বপ্রথম মন্ত্রী করেছেন পাঁচ নির্দলকে, যাঁরা কংগ্রেসের হাটে নিজেদের না বিকিয়ে, বি জে পি'র হাটে নিজেদের বেচেছেন। এন সি পি দলের বিধায়ক কমলেশ সিং কত টাকার বিনিময়ে জে এম এম-কংগ্রেস জোটে নাম লেখান, পরে আরও কত বেশি টাকার সুযোগ পেয়ে বি জে পি শিবিরে যোগ দিয়েছেন, সেই পরিমাণ কোনদিন কি জানা যাবে ? যেমন জানা যাবে না, ইনুস এক্কার পিছনে কোন্ পক্ষের কত পরিমাণ টাকা ছুটেছিল এবং শেষে কত টাকার বিনিময়ে বি জে পি তাকে আপাতত পেয়েছে। এই তো বি জে পি-র নৈতিকতার চেহারা ! এটা কি কংগ্রেসের থেকে উচ্চমানের ?

নির্বাচনের পর গরিষ্ঠতা না পেলেও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার দখল করে বসা বা রাজ্যপালকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার কাজে বি জে পি-ও পিছপা হয়নি। কেন্দ্রের সরকারে থাকার সময় উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সমাজবাদী পার্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বি জে পি ও বহুজন সমাজ পার্টিকে সরকারে বসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। একইভাবে বিহারের নীতীশকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে সরকার দখলের পরিকল্পনা করেছিল বি জে পি। কিন্তু সংখ্যা কম, একথা আস্থা ভোটের আগেই বুঝে গিয়ে নীতীশ কুমার মুখ বাঁচানোর জন্য পদত্যাগ করেন।

সুতরাং, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতি মেনে চলার দায়বদ্ধতা কংগ্রেস, বি জে পি বা অন্য কোনও বুর্জোয়া দলেরই নেই, সি পি এমের মতো তথাকথিত বামপন্থীদেরও নেই। এদের সকলেরই রাজনীতির মূল কথা দাঁড়িয়েছে — দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা কর, তাদের টাকায় তহবিল ভরে নাও এবং সেগুলোর জোর ও তার সাথে ক্রিমিনালদের বন্দুক ও বাহুবল কাজে লাগিয়ে সরকারি ক্ষমতা দখল ও ভোগ কর। ফলে জনগণের কোনও কল্যাণেই এরা আজ আসতে পারে না, বরং জনগণের ওপর চেপে বসে থাকা পুঁজিবাদী শোষণের জগদ্দল পাথরটা পাহারা দেওয়ার দায়িত্বই এরা কাঁধে তুলে নিয়েছে। একথাটা ভারতবর্ষের মেহনতি জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে।

জামশেদপুরে নারী দিবস উদ্‌যাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে জামশেদপুরে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

এই সভায় মহিলারা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে আলোচনা করেন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবিকা গীতশ্রী ঘোষ বলেন, আজও মহিলারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণে জর্জরিত। অপহরণ, বলাৎকার, পণপ্রথা ইত্যাদি প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। সুরেখা সিরকা বলেন, এই ভোগবাদী ব্যবস্থায় মহিলাদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির কোষাধ্যক্ষা কমরেড চন্দনা ব্যানার্জী বলেন, আজ মহিলারা দ্বিমুখী শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন। একদিকে পুরুষপ্রধান সমাজের শোষণ, অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ — যার দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়েই শোষিত-পীড়িত হচ্ছেন। তাই নারীর সমস্যা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে সমাজের সকল অন্যায় শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই সভায় মহিলারা কবিতা পাঠ করেন ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মুর্শিদাবাদে মহিলাদের অবস্থান

মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, লোকসভায় মহিলা আসন সংরক্ষণ নিয়ে দেশজুড়ে যখন নানা গালভরা আলোচনা চলছে তখন স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরেও মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের দয়ারামপুর, পরাশপুর, টলটলি গ্রামের জাহিরা বিবি সহ অনেকেই বন্যা-ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন। সহস্রাধিক পরিবার রিক্ত নিঃস্ব হয়ে অনাহারে অপুষ্টিতে ভুগে তিলে তিলে মৃত্যুর দিন গুণছে। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কাজ, খাদ্য, পুনর্বাসন এবং নারীর নিরাপত্তার দাবিতে, নারীপাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থানের মধ্য দিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা।

সমগ্র জেলা জুড়ে চলছে অশ্লীল ব্লু-ফিল্ম, ভিডিও হল, সি ডি পার্লার, চোলাই মদের ঠেক, গাঁজা ও আফিংয়ের চাষ। রাজ্য সরকারের বদান্যতায় ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, যার বিষময় ফল হিসাবে মা-বোনেরা, বিশেষ করে কিশোরীরা ধর্ষিতা, গণধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এই সমস্ত অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা মা-বোনেরা ৮ মার্চের বিক্ষোভ অবস্থানে প্রতিবাদ জানাতে এসেছিলেন। স্লোগান, সঙ্গীত ও বক্তব্যে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা প্রশাসনিক ভবন চত্বর।

এই বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার সহ জেলা এম এস এস-এর উপদেষ্টা কমরেড্স্ অনুরাধা মণ্ডল, গুলশনআরা ইভা, গীতা ভট্টাচার্য ও রত্না বাগচী এবং জেলার প্রবীণ বামপন্থী ব্যক্তিত্ব প্রাণরঞ্জন চৌধুরী । এছাড়া এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্য কমরেড খাদিজা বানু বক্তব্য রাখেন। তিনি বিশ্বায়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র নারীসমাজকে সংগঠিত করে আন্দোলনের আহ্বান জানান।

ধর্মঘটে অচল ফ্রান্স

সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা কর্মসময়ের দাবিতে ১০ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের দিনে তথাকথিত শিক্ষাসংস্কারের প্রতিবাদে প্যারিসে বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীরা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও'র জয়

৯ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন নির্বাচনে এ আই ডি এস ও ১৪টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের ফি থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন ফান্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত, পুনরায় হোস্টেল চার্জ ও টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়ে পানীয় জলের সমস্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও দীর্ঘদিন ধরে যে লাগাতার আন্দোলন পরিচালনা করছে, তারই ধারাবাহিকতায় ডি এস ও এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। মোট ৪৩টি আসনে এ আই ডি এস ও তাদের প্রার্থী দেয়। শাসক সি পি আই (এম) দলের পেটোয়া ছাত্রসংগঠন এস এফ আই-এর নানা হুমকি এবং প্ররোচনা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্লাসে এস এফ আই-কে পরাস্ত করে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা জয়ী হয়। বলা বাহুল্য, এই জয় এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in